পিছু ডাকে

এষা বসু

আমার শৈশবের আনন্দময় স্মৃতি যুক্ত হয়ে আছে প্রথমতঃ বিহার তথা পাটনার সাথে। আমার স্মৃতি শুরু এর অনেক আগে থেকে কিন্তু ছেলেবেলা বললেই আমার পাটনার কথা মনে হয়। এমন খুশীভরা উজ্জ্বল দিন- রাত আমার জীবনে তারপরে আর আসেনি। আমার জ্ঞানের উন্মেষ আসানসোলে ,সেখান থেকে কলকাতায় আসি, তারপর গৌহাটি তার মাঝে অল্প কিছু সময় ইস্ফল । পাটনা যাই গৌহাটি থেকে।

গিয়ে উঠলাম শহরের বাইরে একটি বড় বাগান বাড়ীতে। এখান থেকে আমার আনন্দ-যাত্রা শুরু। পরবর্তী কালে যখনই কোন উপন্যাসে বাগান বাড়ীর কথা পড়েছি তখনই সেখানে এই বাড়ীটিকে বসিয়ে দিয়েছি। '' শ্রীকান্ত" যখন পড়লাম রাজলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হল এই বাড়ীতে কারণ রাজলক্ষ্মী পাটনায় ছিল। সেই বাড়ীতে যখন আমি যাই তখন স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি, তাই সারাদিন চষে বেড়ানোর সুবিধা ছিল। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল বাগানের একপাশে দোতলা বাড়ী। মালিক শহরে থাকত আর বাড়ীটি ভাড়া দিত। বাড়ীর পাশে বড় ও গভীর ইঁদারা এবং সেদেশী প্রথা মাফিক বাঁশের মাথায় দড়ি দিয়ে বালতি বাঁধা এবং বাঁশের অপর প্রান্তে মাটি লেপে ভারী করা। এই ছিল বাড়ীর জলের ব্যবস্থা। একজন মালী ছিল বাগানের জন্য, সকালে এসে সারাদিন কাজ করে বিকেলে চলে যেত। কাছাকাছি কোথাও হয়তো আস্তানা ছিল। মাথায় গামছা দিয়ে পাগড়ী বেঁধে গাছের পরিচর্যা করত। আমরা মানে আমি আর তিন বছরের বড় দিদিভাই মোটেই পছন্দ করতাম না মালীকে। কারণ ? সময়মত বলব। বাড়ীর সামনে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে ছিল গোলাপ বাগান। অজস্র গোলাপ ফুটে থাকত। গেট দিয়ে ঢুকেই ছিল একটি বড় আমগাছ,ছিল পেয়েরা

গাছ- যা আয়তনে বড় ফলও দিত বড় এবং সুস্বাদু। ছিল তুঁত গাছ, যা ওখানেই দেখেছিলাম । প্রচুর কলমের আমগাছ ছিল। পেঁপে গাছে বড় বড় পাকা পেঁপে হত। এছাড়াও চাষ হত, অড়হর, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি। কলা গাছও ছিল।

এই বাগানে দাপাদাপি করে বেড়াতাম,তবে শুধু এইতেই সাধ মিটত না- বেরিয়ে পড়তাম পাঁচিলের বাইরে। খানিকটা মেঠো পথ দিয়ে গিয়ে পাকা রাস্তা যা শহরে গেছে। ঐ কাঁচা রাস্তার পাশে চাষের জমি- যা ছিল আমাদের মনোযোগের বিষয়। ঐ জমিতে কি চাষ হচ্ছে নজর রাখতাম; কাঁচা খাওয়া যাবে কিনা! এইখানেই ছিল এক জজ সাহেবের বাড়ী। আমাদের সাম্রাজ্য আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বড় রাস্তায় গিয়ে উঠতাম,তারপর এগিয়ে গিয়ে ছিল এক কুল গাছ- সেটি ছিল আমাদের গন্তব্য।

এই কুল তলায় প্রথমদিকে আমাদের যাওয়ার এলেম ছিল না। ঐ কুলগাছের তলায় ছিল একটি জলের কল। আমদের খাবার জল নেওয়া হত ঐ কল থেকে। মার পিছু পিছু যাওয়ার সুবাদে গতিবিধি ঐ পর্যন্ত গড়ায়। একদিন বোধহয় আমার শরীর ভাল ছিল না, ঠিক মনে নেই- মার সঙ্গে দিদিভাই গিয়েছিল জল আনতে। বাড়ীতে আমি একা ,মালীও ধারে কাছে ছিল না। ষাটের দশকের মাঝামাঝি এক বাগান বাড়ীতে একটি শিশু কন্যাকে রেখে দূরে রাস্তায় জল আনতে যাওয়া যেত ,এটা এখন ভাবতেই আশ্চর্য বোধ হয়। সে সময় মানুষের উদ্বেগ কত কম ছিল। খুব দ্রুত একটি জরুরী কাজ সেরে ফেললাম !বাড়ীর সামনে যে গোলাপ বাগান ছিল তার ফুল ক্ষিপ্র হাতে তুলে ফেললাম-সমস্ত বাগান ন্যাড়া। একটু পরে মা ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল, আমি কেন এত ফুল তুললাম, তা দিয়ে কি করব! আমাকে বকতে আরম্ভ করল, ইতিমধ্যে হাজির মালী; তার তো দেখেই মাথা গরম, প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করল। তার দীর্ঘ দিনের পরিচর্যার ফসল ঐ ফুল, আমি কয়েক মিনিটে ধ্বংস করে দিলাম। বাগান ধ্বংস করতে পেরে আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কেন এমন করেছিলাম তার ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। যে জজ সাহেবের বাড়ীর কথা আগে বলেছি, সেই বাড়ীতেও একটা লাল টুকটুকে গোলাপ ফুটেছিল, তক্কে তক্কে থেকে এক দুপুরে হস্তগত করেছিলাম ফুলটিকে। প্রকৃতি

মানুষের শুশ্রূষা করে তাকে সজীব এবং সহনশীল করে-কিন্তু আমি বড় হওয়ার প্রথম অধ্যায়ে প্রকৃতিকে কাছে পেয়েও ছিলাম ধ্বংসাত্মক।

আবার ঠিক এর উল্টো ঘটনাও আছে। মিষ্টির একটি বড় ভাঁড়ে মাটি দিয়ে ঐ গোলাপ গাছের ডাল কেটে লাগিয়ে ঘরে রেখেছিলাম। কিছুদিন বেঁচেছিল গাছটি, আমার কি আনন্দ! আমার গোলাপ গাছ! কিন্তু এ গাছ তো অনেকখানি যত্ন দাবী করে তাই মরে গেল কদিন পরে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

পাকা তুঁত গাছে ভরে থাকত- খেতাম, সেই প্রথম সেই শেষ। কিছুদিন খেয়েছিলাম যতদিন গাছে ছিল। তারপর কোথাও ঐ গাছ আর দেখিনি। আমরা ওখানে কয়েকমাস ছিলাম। তারপর অন্য এক বাড়ীতে ভাড়া যাই, কেন যাই জানিনা।

শুটিওয়ালা এক রকমের ছোট গাছের চাষ হত বাগানে, ওগুলো তখন বেশ ডাঁটো ছিল। আমরা যখন তখন গাছ থেকে নিয়ে খেতাম, যেন আমাদের জন্যই ওসব হয়েছে। ওগুলো সম্ভবত অড়হর নয়, তাহলে অমন ছোট গাছে এত ফল হত না। বিশাল পাকা পেঁপে, গাছে হলুদ হয়ে ঝুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, কখন পাড়ব সেই অপেক্ষায়। ঝুলঝাড়া বা ঐ রকম কিছু দিয়ে পাড়তে পারলে সেদিন আর আনন্দ ধরে না। যেমন মিষ্টি তেমনি সুস্বাদু। নারকেল আমাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল ,আর আম বা তালের সময় সেটা নয়। শুধু গাছ তখন আমাকে আকর্ষণ করত না, নজর ছিল ফুল আর ফলের দিকে। ঘরের সামনে ছিল বিশাল এক পেয়েরা গাছ। মিষ্টি পেয়ারায় ভরপুর গাছের ডাল। আমাদের সাধ্যমত নীচের পেয়েরাগুল হস্তগত করার পর একদিন ঘর থেকে একটা টুল বার করে দিদিভাই গাছে উঠে মনের আনন্দে একের পর এক পেয়ারা ছিঁড়ে নীচে ফেলছে আর আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি। এমন সময় যমদূতের মত মালী এসে হাজির , আমি ভয়ে দৌড়ে ঘরে, দিদিভাই গাছ থেকে নামতে পারেনি, মালী টুলটা নিয়ে গজ গজ করতে করতে চলে গেল। দিদিভাই ভয়ে কেঁদে ফেলল।

যে পাকা রাস্তার কথা বলেছি তার অপর পারে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ (তখন অন্তত তাই মনে হত)। সেই মাঠ পেরিয়ে গিয়ে আবার রাস্তা, সেই

রাস্তার উল্টো দিকে এয়ারপোর্ট। এই মাঠে বেশ বড় রকমের মহুয়া বন ছিল। উঁচু গাছগুলোয় সে সময় মহুয়া ফুল ধরেছিল, তারপর ফল আসল। ঐ মাঠে গেলে মাঝে মাঝে মহুয়া ফুল কুড়িয়ে আনতাম। এটি ছিল খেলার অঙ্গ। ঐ গাছগুলোতে শয়ে শয়ে টিয়া পাখী আসত, মাঠেও ঘুরে বেড়াত। কলকাতায় যেমন সর্বত্র কাক বা শালিক দেখা যায় পাটনার উপকণ্ঠে তখন সেরকম টিয়া দেখা যেত।

ঐ মাঠে মাঝে মাঝে কিছু লোক একটা লম্বা লাঠি আর সাদা বল নিয়ে খেলত, পরে জেনেছি ওটা গলফ খেলা। যদিও ওটা খেলা বুঝেছিলাম কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ঐ খেলা সম্পর্কে উৎসাহ আসত না, এমনও হতে পারে বুড়ো বুড়ো লোক দেখে আর ওদিকে মনোযোগ দিতে ইচ্ছা করত না। এক বিকেলে ঐ মাঠে ছুটো ছুটি করছি হঠাৎ নজর গেল একটি ডুলি যাচ্ছে মাঠের উপর দিয়ে, দৌড়ে গেলাম কাছে। নূতন বৌ ভিতরে বসা আর বর পায়ে হেঁটে পাশে পাশে চলেছে। মার কাছে জেনেছিলাম ওগুলোর নাম ডুলি । এখানকার বিবাহ বিষয়ে পরে আবার বলব।

আমাদের দুধ দিত স্থানীয় এক বিহারী মহিলা, যার বাড়ী এই বাড়ীর কাছেই, তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল আমাদের। কালো, লম্বা বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। বড় ঢল ঢলে ফতুয়ার মত ব্লাউজ পরত, আর বিশেষ এক ধরণের ছাপা শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দুধ ভরা লোটা মাথায় চাপিয়ে আসত। পাড়ের দিকটা ঘন ফুলের ছাপা, আর ঐ ফুলই জমিতে দূরে দূরে ছাপা, পরে দেখলাম ওইরকম ছাপা শাড়ী ওখানে সবাই পরে। পরে বড় হয়ে ঐ ধরণের ছাপা শাড়ী আমারও একটা জুটেছিল, আমি খুশী হয়ে পরেছিলাম।

একদিন দুধ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তার পিছু ধাওয়া করলাম আমরা দুই বোন, তার বাড়ী গেলাম, কিন্তু আমার প্রিয় সেই মানুষটির নাম আজ আর মনে নেই। তার বাড়ীর সাথে বেশ কঘর বসতি ছিল। ঝকঝকে নিকনো উঠোন, আর এদিক ওদিক সেদিক দিয়ে এক একটি ঘর উঠেছে। কখনো মুখোমুখি কখনো পাশাপাশি কখনো বা একটির পিছনে একটি। কিন্তু ঘরগুলি সব একই রকম মাটির মেঝে, মাটির দেওয়াল, ছাদ খড় দিয়ে ছাওয়া। এর মধ্যে একটি

জিনিষ আমায় মুগ্ধ করল- প্রত্যেকের ঘরের দরজার বাইরে একটি করে শিল পোঁতা রয়েছে, মশলা বাটার তলটি মাটির একটু উপরে জেগে রয়েছে, আর বাকীটা মাটির নীচে। এর পাশেই একটি ছোট্ট গর্ত খোঁড়া। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম মশলা বাটা, আর ধুয়ে জল টল যা হল ঐ গর্তে ফেলে দিল। উঠোন যেমন ছিল শুকনোই থাকল। ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেকগুলো পরিবার এরা একই উঠনের উপর ঘর করে থাকে। উঠোনে একটিমাত্র ধানের গোলা ছিল, সেটা কার বা সকলের কিনা সেটা জানা বা বোঝার মত বোধ ছিল না ।

আমরা পরের বছর কোয়ার্টারে চলে যাই এবং শহরের স্কুলে ভর্তি হই। এই স্কুল থেকে ফেরার পথে এই মানুষটির সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। ছেলে অসুস্থ তাকে শহরে চিকিৎসা করিয়ে ডুলিতে নিয়ে বাড়ী ফিরছিল, নিজে পায়ে হেঁটে। দেখা হয়ে আমি অবাক হয়েছিলাম,সে খুশী হয়েছিল, আমাদের সত্যিই স্নেহ করত। এরপর কর্ম জীবনে প্রবেশ করে উত্তর বিহারে দ্বারভাঙ্গা জেলায় ট্রেনিং নিতে গিয়ে সেখানে হস্টেলে থাকতে হত। ক্যান্টিন থেকে দুবেলা ভাত তরকারি নিয়ে আসত এক মাসী যে বৃদ্ধা, লম্বাচওড়া, কালো রং, তেমনি সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ী পরা- আমার সেই ছেলেবেলার স্মৃতি ফিরে আসতো।

আমরা এখানে শীতকাল বসন্ত কাল কাটিয়েছিলাম। আমের বোল আসতে দেখেছিলাম, আর রাস্তার পাশের জমিতে বোধ হয় ঝিঙে গাছে হলুদ ফুল এসেছিল, যার কিছু আমার হাতে নিহত হয়। বসন্ত আসল, আসল দোল। কিন্তু বিহারের দোল আমাদের মত একদিনের নয়। মাস খানেক আগে থেকে সন্ধ্যাবেলা শুরু হত ঢোল বাজিয়ে রামা হো গান। বেশ রাত পর্যন্ত চলত, আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। দোল যত এগিয়ে আসতে লাগল এদের উত্তেজনার পারদ চড়তে লাগল। বোধ হয় দু একদিন আগে থেকে দুপুরে ঢোল নিয়ে রাস্তায় গান গাইতে বেরত। নূতন সাদা ধুতি জামা পরে তার মধ্যে রং লাগিয়ে মনের আনন্দে উৎসব করত। আমাদের যেমন রং খেলতে গেলে পুরনো বাতিল পোশাক পরার রেওয়াজ, এদের ঠিক উল্টো। ওদের দুটি উৎসব বড় করে পালন করতে দেখেছি, এক দোল বা ওদের ভাষায় হোলি আর দ্বিতীয়টি আরও কিছুদিন পরে দেখলাম দিওয়ালী। সে কথা পরে বলব। এক মাসের

গান শেষ হত হোলির দিন। নূতন পরিচ্ছদ পরে পথে আবীর উড়িয়ে ঢোল বাজিয়ে গাইতে গাইতে যাওয়া ছিল এই উৎসবের শেষ অংশ। এই উপলক্ষে আমরা প্রথম লিটটি খেয়েছিলাম। হয়তো ওদের সব উৎসবেই এই খাবার হত কিন্তু আমাদের কাছে এই প্রথম। আমরা ঐ গোয়ালিনীর বাড়ী গিয়েছিলাম আর লিটটি নিয়ে এসেছিলাম। একটি নূতন খাবারের সঙ্গে পরিচয় হল। আর দোল যে এত দীর্ঘস্থায়ী আনন্দদাতা উৎসব তা জানলাম। অবশ্য এর আগে দোল ব্যাপারটিকে আমি ভয় পেতাম-আর একটু বড় হয়েও ভয় পেয়েছি, এখনও এই ব্যাপারটি এড়িয়ে চলি।

এখানে যে বিয়ের উৎসব দেখেছিলাম বলে নিই। প্রথম দেখলাম বাড়ীর মালিকের এক সদস্যের বিয়ে। তারা শহরে থাকত, বিয়ে হয়েছিল শহরেই, কিন্তু পরিবারের প্রথা মেনে পুরনো ভিটেয় এসেছিল কিছু অনুষ্ঠান করতে। প্রচুর লোকজন এসেছিল আর যার বিয়ে সে হলুদে ছোপান কাপড় পরেছিল। পুরোহিত সমেত বাগানে কিছু আচার পালন করে চলে গেল। আমার দুঃখ হয়েছিল নেমন্তন্ন হল না বলে।

এছাড়া পথে বিয়ের শোভাযাত্রা দেখেছি । সাধারণ লোকের বিয়েতে শোভাযাত্রায় ব্যান্ড পার্টি বাজত আর ধনী হলে হাতির পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে বর বসত, বাজী বাজনা সমেত বিয়ে করতে যেত বর। কেউ কেউ পাগড়ীর সাথে তরোয়াল নিত, পরে শুনেছি তারা ক্ষত্রিয়। কেউ যেত পালকি সাজিয়ে, তবে এই যাত্রা ছিল ধীর লয়ের, কারণ দেখানোর ব্যাপার থাকত। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই যাত্রা দেখতাম।

এরপর বিয়ের নেমন্তন্নও পেয়েছি তবে তখন আর ঐ বাগান বাড়ীতে আমরা ছিলাম না। শহারতলীর কোন পাড়ায় থাকতাম। বিয়ে দেখেছিলাম-ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিল, আর কিছু মনে নেই; তারপর খাবার ছিল ঠাণ্ডা শক্ত পুরী আর লাড্ডু, সেই ছেলেবেলায়ও যা ভাল লাগেনি।

আমার প্রথম হাতি আর ঘোড়া দেখা এখানেই। আমাদের বাগান বাড়ীর কাছাকাছি কোথাও এক ধনী ব্যক্তি থাকত, তার হাতি ছিল। মাঝে মাঝে মাহুত হাতি নিয়ে বেরত অথবা আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম, যা আমাদের

কাছে আকর্ষণের বিষয় ছিল। এই সময় একটু আধটু হয়তো পড়তে বসতাম, প্রায় সারাদিনই ছিল খেলার জন্য। আমাদের তিন বছর বয়সে স্কুলে যেতে হত না, সুতরাং কুল, অড়হর, তুঁত, পেয়ারা ইত্যাদি।

আমরা ছিলাম বাড়ীটির একতলায়, আমাদের পাশের ঘরে একজন বা দুজন ব্যক্তি থাকত, তাদের রান্নাবান্না কাজকর্ম করার জন্য একজন লোক ছিল নেপালী, তার নাম বাহাদুর। সে যখন সন্ধ্যাবেলা রুটি বানাত,সেটা ছিল আমাদের কাছে দর্শনীয়। আটার একটা বিরাট তাল মাখত, মাখা হয়ে গেলে তার মধ্যে অল্প অল্প জল দিত আর ঠাসত, চলতেই থাকত এই প্রক্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে। এই পর্ব শেষ হলে খুব বড় বড় লেচি করত, তারপর থাবড়ে থাবড়ে হাত দিয়ে রুটি বানাত, চাকি বেলুনের কোন পাট ছিল না। খুব মোটা মোটা রুটি গড়া হত, তারপর ভাজার পালা। চাটুতে রুটি দিয়ে একটি ছোট কাপড়ের টুকরো দিয়ে চেপে চেপে রুটি সেঁকা হত, সরাসরি আগুনের উপর দেওয়ার বালাই ছিল না। ঘরে মাকে দেখেছি রুটি করতে, কিন্তু বাহাদুরের রুটির বিপুল আকৃতি এবং বানানোর পদ্ধতির জন্য আমাদের কাছে ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা বাহাদুরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মোটা মোটা রুটিও যে নরম তুলতুলে হয় আর কাঁচা থাকে না তখন চোখে দেখেছিলাম পরে নিজে বড় হয়ে পরখ করে দেখেছি কথাটা সত্যি। আমরা যে পদ্ধতিতে রুটি বানাই তা এত নরম হয় না। বিহারের লোকেদের দেখিছি রুটি বিষয়ে খুব যত্ন, আর আদরের খাবার।

এই বাড়ী ছেড়ে আমরা ঘন বসতি অঞ্চলে চলে যাই, সেখানে দেখেছি আটা কেউ কেনে না, প্রতিটি বিহারি পরিবার গম কেনে। সেই গম বাছে , ঝাড়ে তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ছাদ বা উঠানে শুকাতে দেয়। গম শুকিয়ে ঝর ঝরে হয়ে গেলে গম ভাঙানো দোকানে যায় ঐ গম নিয়ে। ওখানে কলকাতার মত গম ওজন করে মেশিনে ঢেলে দিল অন্য গমের সঙ্গে আর যে আটা আগেই বেরিয়ে এসেছে তা দিয়ে দিল ওজন করে, এমনটি হত না। যে যার গম আলাদা করে পেষাই করে নিয়ে যেত, কেজি পিছু ভাঙানোর পয়সা দিয়ে। যেহেতু আটা গরম থাকত তাই বাড়ী এনে কাগজ পেতে বিছিয়ে ঠাণ্ডা হলে

তবে কৌটো ডাব্বায় বন্দী করত। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত রুটি নয়, কিন্তু আমরা চালের তেমন কোন যত্ন করি না, খুব দায়ে পড়লে কাঁকর বাছা ছাড়া।

এই বাগান বাড়ীর দোতলায় একটি পরিবার ভাড়া থাকত, তাদের একটি বাচ্চা ছেলে ছিল, সেই বাচ্চার মামার বাড়ী পাটনা শহরে। বাচ্চার মাসীরা মাঝে মাঝে আসত, তারা অনেকগুলি বোন, কয়েকজন স্কুলে পড়ত দুএকজন কলেজে। স্কুল পড়ুয়া বোনেদের সঙ্গে আমাদের ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে খেলতাম বাগানে ঘুরতাম। দল বর্ধিত হওয়ায় আমাদের আনন্দ এবং দাপট দুইই বেড়ে যেত। আমরা এই কয়েকজন মিলে বনভোজনের আয়োজন করেছিলাম, কি রান্না হয়েছিল কি খেয়েছিলাম সে সব মনে নেই, শুধু হাঁড়ি কড়াই নিয়ে ছুটোছুটি করছিলাম এইটুকু মনে আছে।

এই মহুয়া গাছ, এই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া, অড়হর ক্ষেত সব ছেড়ে আমরা অন্য একটি বাড়ী ভাড়া করে চলে যাই। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে একটি মুদীর দোকান ছিল। সেখানে শ্রমজীবী লোকজন দু-চার পয়সার জিনিষ কিনতে আসত। ঐ দোকানদারের সঙ্গে ক্রেতাদের প্রায়ই বচসা বাঁধত এক কিরি অর্থাৎ এক নয়া পয়সা নিয়ে।দোকানদার ফেরত দিতে পারত না আর ক্রেতাও ছাড়বে না। ক্রেতা বলত এক নয়া এক নয়া করে ছাড়তে ছাড়তে আমার অনেক পয়সা চলে যাবে। মনে রাখতে হবে সময়টা ষাটের দশকের মধ্য ভাগ আর ক্রেতারা অতি দরিদ্র। আমাদের কাছে এই ঝগড়াও দর্শনীয় ছিল। পৃথিবীর যা কিছু দেখতাম হাঁ করে থাকতাম।

আমার মনে পড়ে এক শীতে টীকা দিতে গিয়েছিলাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে সেখানে গাঁদা ফুলের বাগান ছিল, ফুলে ফুলে আলো হয়ে। পরবর্তীকালে উঁচু ক্লাসে যখন ড্যাফোডিল পড়ি তখন কবির এক লহমায় হাজার হাজার ফুল দেখার চিত্রে আমার চোখে ভেসে উঠত ঐ গাঁদা ফুলের দৃশ্য।

এরপর আমরা বাড়ী পাল্টে আর এক বাড়ীতে যাই , সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলাম (তখন অবশ্য ওসব আমি কিছু জানতাম না, যা দেখি সবই নূতন) বিহার তথা পশ্চিমের বাড়ীর একটা কায়দা আছে-তা হল মাঝখানে বাঁধান

উঠোন আর তার চারপাশ দিয়ে ঘর, সব দিকই বন্ধ কোনপাশে খোলা বা বারান্দা নেই, যা আছে তা ভিতরে। একতলার উপর দোতলা তার উপরে তিনতলা, সবই চারপাশে ঘর মাঝখানটা ফাঁকা। এখানে এসে বাড়ীর একদিকে পেলাম ভুট্টাক্ষেত । তখন বর্ষাকাল ভুট্টার চাষ হয়েছে। এখানে অবশ্য আমদের শুধু দর্শকের ভুমিকায় থাকতে হল, তার কারণ আশে পাশে যথেষ্ট বাড়ী, ক্ষেত সম্ভবত তাদের, আর ক্ষেতে কেউটে সাপ দেখেছিলাম। যার জন্য ঐ ক্ষেতের একটা ভুট্টাও আমাদের উদরস্থ হয়নি। এখান থেকে আমাদের পুরনো বাসস্থান সেই বাগান বাড়ী খুব একটা দূরে ছিল না। তাই এখান থেকে বার দুয়েক ঠাকুমার সাথে ঐ মহুয়া গাছের তলায় গিয়েছিলাম।

এই ভাড়া বাড়ীতে থাকাকালীন একদিন গরমকালে মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসেছিলাম। হঠাৎ পাশের বাড়ীর ছাদে হুড় মুড় করে কে দৌড়ে উঠল, আমি বুঝতে পারিনি। পিছন পিছন আর একজন উঠল। তখন দেখলাম পাশের বাড়ী ভাড়া থাকে একটি বৌ ছুটে উপরে এসেছে আত্মরক্ষা করতে, তার পিছনে তার বর ছুটছে হাতে লাঠি নিয়ে মারতে মারতে, কেন জানি না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আরও ছোট ছিলাম কলকাতার কথা-আমরা যেখানে ভাড়া ছিলাম সেই বাড়ীওয়ালা অফিস থেকে এসে বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল এবং আমার চোখের সামনেই বটি ছুঁড়ে মারে বউকে। কপাল কেটে গিয়ে হুহু করে রক্ত বেরতে আরম্ভ করে , আর বৌটি বসে কাঁদছিল মনে আছে। তার ছেলে আমার খেলার সাথী ছিল। আমার মা তখন গিয়ে রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করেছিল আর সান্ত্বনা দিয়েছিল বুঝতে পারি।

পাটনায় এই বাড়ীর আমরা কজন ভাড়াটে মিলে সপরিবারে এয়ারপোর্ট দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে একসাথে খাওয়া হবে ঠিক হয়েছিল। ফিরে আমরা পরটা আলুর দম সিমুইয়ের পায়েস খেয়েছিলাম। বেশ ভালই কেটেছিল দিন। আমাদের পাশের ঘরে থাকত স্বামী-স্ত্রী দুজন, সন্ধ্যাবেলা বৌটি বারান্দায় বসে রুটি বেলছিল, কি হল বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ লোকটি বৌটির হাতের বেলুন কেড়ে নিয়ে দমাদম দু ঘা বসিয়ে দিল পিঠে। সহৃদয় পাঠকদের বলছি (পাঠিকা নয়) এর ছাপ একটু একটু করে পড়তে লাগল আমার মনে।